ধারাবাহিক রচনা

স্বামী গম্ভীরানন্দজীর পুণ্যস্মৃতি

স্বামী চেতনানন্দ

[রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একাদশ অধ্যক্ষ পরমপূজনীয় স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের পূতসঙ্গধারায় দীর্ঘদিন স্নাত হয়েছেন লেখক। বর্তমানে আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ তাঁর সেই অন্তরঙ্গ স্মৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেছিলেন গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, অদ্বৈত আশ্রমে। পূজনীয় মহারাজের অনুমতিক্রমে সেই অমূল্য স্মৃতি নিবোধত-র পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় দ্বিতীয় পর্ব।]

তখন স্বামীজীর সেন্টিনারি-র কাজ চলছে। পার্ক সার্কাসে অনুষ্ঠান হয়েছিল। অদ্বৈত আশ্রমে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ জন সাধু অতিথি হিসেবে ছিলেন। সকাল ছটায় তো টিফিনের ঘণ্টা দিতেই হবে। আমি সাড়ে চারটেয় উঠতাম। তখন ওখানে সরকার চুলা ছিল—গ্যাস ছিল না। তাতে কাঠ-কেরোসিন জ্বালিয়ে কয়লা দিতাম। ওদিকে ময়দা ঠাসতাম আর জপ করতাম। তারপর রাঁধুনি ঠাকুর এসে সাহায্য করত। যদি ছটার ঘণ্টা দিতে একটু দেরি হত, রান্নাঘরের দরজায় এসে গম্ভীর মহারাজ বলতেন—May I help you? ঠিক সময়ে ঘণ্টা না দেওয়ার জন্য লজ্জিত হতুম। অর্থাৎ আমি আমার ডিউটি ঠিকমতো করছি না।

একদিন বললাম—মহারাজ, স্বামীজীর একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনী হওয়া উচিত।

—দেখো, ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো হবে।

একদিন মহারাজ আমায় বললেন—তুমি কি জান শ্রীকৃষ্ণের শেষ বাণী কী?

—না।

—তাহলে শোনো। যখন অসুরদমন হয়ে গেল, সব শেষ হয়ে গেল, তখন, জীবনের শেষ অংশে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রয়েছেন। পথ দিয়ে চলেছেন। গৃহবধূরা কৃষ্ণকে দেখে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। বলছে—ওঃ, কৃষ্ণ যেখানেই যান সেখানেই যুদ্ধবিগ্রহ, ধ্বংস। তখন কৃষ্ণ তাঁর মনের কষ্ট শিষ্য উদ্ধবকে বলছেন—আমি শরীর ছেড়ে দেব।

—কেন প্রভু?

—স্বয়ং ভগবান হয়েও কিছু করতে পারলাম না। গৃহবধূরা পর্যন্ত আমায় দেখে দরজা-জানলা বন্ধ করে দেয়। একদিন খুব খিদে পেয়েছে, এক বুড়িকে বললাম—দুধ দাও। তা তার দুধের পাত্র পড়ে ভেঙে গেল।

—আপনি ধর্মের রক্ষক ও প্রবক্তা, আপনি চলে গেলে আমাদের কী হবে?

—না। এবার শরীর ছেড়েই দেব ঠিক করেছি। ভগবান হয়েও আমি এ-জগতের কিছু করতে পারলাম না। এ-জগতে কারও কিছু করবার নেই।

এই-ই শ্রীকৃষ্ণের শেষ বাণী।

এ-গল্পটি বলে গম্ভীরানন্দজী আমায় বললেন—জগতটা কুকুরের লেজ, যতই চেষ্টা করো কিছুতেই সোজা করতে পারবে না।

প্রসঙ্গত বলি, আমাদের একজন সাধু বলতেন—There are four aphorisms of the dog's curly tail. First aphorism বা সূত্র—এ-জগতটা কুকুরের লেজ। দ্বিতীয়—এটাকে আমরা সোজা করবই করব। তৃতীয়—আমরা বিফল হবই হব। আর চতুর্থ aphorism হল—এটাকে সোজা করতে গিয়ে আমরাই সোজা হয়ে যাব।

এমনিতে গম্ভীরানন্দজী সিরিয়াস ছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে খুব মজার কথাবার্তা বলতেন। একবার রাশিয়ান মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা-কে কলকাতায় নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। স্বামী দয়ানন্দজী, গম্ভীর মহারাজ এবং ভরত মহারাজ তিনজন গিয়েছিলেন। ফিরে এসে গম্ভীর মহারাজ আমাকে বললেন—ওহে, আজ নতুন বাংলা শিখে এলাম।

—কীরকম মহারাজ?

—ভ্যালেন্টিনা করেছে কী জান? বাংলা ভাষা রাশিয়ান স্ক্রিপ্ট-এ লিখে তার ভাষণ পড়লে : আপনাদের দেশে আসিয়া আমাদের অত্যন্ত গরম লাগিয়াছে। তবে এ আবহাওয়ার গরম নয়, আপনাদের হৃদয়ের গরম।

তারপর আমাকে মহারাজ বললেন—তুমি হৃদয়ের গরম-টরম কিছু বোঝো?

—না, মহারাজ।

এক ভক্ত ছিলেন, নাম সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শ্রীশ্রীমার শিষ্য। স্ত্রী মারা গেছেন। এসে কাঁদতেন গম্ভীর মহারাজের কাছে। মহারাজ বললেন—দেখুন আমার অত সময় নেই। ওই যে ছেলেটা অফিসে বসে আছে, ওর কাছে গিয়ে বলুন। আমার কাছে বসে তিনি কাঁদতেন। বলতেন—আপনাদের দেখে আমার বড়ো ঈর্ষা হয়। সেই ছোটোবেলায় সংসার ছেড়ে এসে ভগবানের জন্য কাজ করছেন। আর আমার এই বুড়োবয়সে স্ত্রী মারা গেছেন, কী যে করব! বুড়োবয়সে বউ মরলে বড়ো কষ্ট!

আমি আর কী করি, একটু হাঁ হুঁ করতাম।

একদিন মতি মহারাজ (স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী, মহাপুরুষ মহারাজের সেবক ছিলেন, পরে শ্যামলাতালের মোহন্ত হন) গম্ভীর মহারাজকে বললেন—এই ছেলেদের কিছু উপদেশ দিন।

—কেন উপদেশ দিতে যাব? ওরা আমার জীবন দেখছে না? মাই লাইফ ইজ মাই মেসেজ। আমার জীবন দেখুক, আমি কীভাবে সাধুজীবন যাপন করি!

স্বামী শাশ্বতানন্দজীর যখন শরীর চলে যায়, তখন বীরেশ্বরানন্দজী জেনারেল সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কেউ ছিলেন না। গম্ভীর মহারাজকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি করে বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব হল। অদ্বৈত আশ্রমে সব বড়ো ট্রাস্টিরা এসে ওঁকে বারবার অনুরোধ করলেন। উনি বললেন—না। তারপর সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী বললেন—তুমি এখুনি চলে এসো। সেই সাধুর কী ব্যক্তিত্ব ছিল! গম্ভীর মহারাজ না করতে পারলেন না। সেই উপলক্ষ্যে অদ্বৈত আশ্রমে বিরাট ভাণ্ডারার ব্যবস্থা হল। আড়াইশো জন সাধু খাবেন—আমি ভাণ্ডারি, দৌড়ঝাঁপ করছি। চোদ্দো রকম আইটেম হবে, আইসক্রীম আসবে। তা একদিন আমাকে গম্ভীরানন্দজী বলছেন—Hello young man, why are you working so hard to throw me out from this place?—হে যুবক, তুমি আমাকে এই আশ্রম থেকে বিতাড়িত করবার জন্য এত দৌড়ঝাঁপ করছ কেন?

১৯৬৩ সালে আমার বেলুড় মঠে ট্রেনিং সেন্টারে যাওয়ার কথা। গম্ভীর মহারাজ বললেন—না না, যেতে পারবে না। স্বামীজীর কাজ করো, এখানে লোকের অভাব।

তখন সকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত একটানা কাজ চলত। দিনের পর দিন। আমার কাজ ছিল প্রুফ দেখা, ফটো ডিপার্টমেন্ট, ভাণ্ডার দেখা। একদিন মঠে গিয়ে মাধবানন্দজীকে বললাম—

মহারাজ, গম্ভীরানন্দজী বলেছেন আমি এবার ট্রেনিং সেন্টারে আসতে পারব না। স্বামীজীর কাজ করতে হবে।

—গম্ভীরানন্দ ঠিক বলেছে। তুমি ভাবছ তুমি একবছর জুনিয়র হয়ে যাবে? জুনিয়র-সিনিয়র কাকে বলে জান?

আমি চুপ।

—যে ঠাকুরের কাছের সে সিনিয়র। যে ঠাকুর থেকে দূরে সে জুনিয়র। তুমি একবছর আগে সন্ন্যাস পেলে সিনিয়র হয়ে যাবে না।

১৯৬৪ সালে আমি ট্রেনিং সেন্টারে যাই। গম্ভীরানন্দজী তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, লেগেট হাউসের মাঝের ঘরে থাকতেন। আমি প্রতি রবিবার ওঁর ঘরে বইপত্রের ধুলো ঝাড়তে যেতাম আর ওঁর জুতো পালিশ করতাম। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন আমায় বলছেন—হাসপাতালে দেখতে গেলাম মৃত্যুঞ্জয়ানন্দকে (আসানসোলের মোহন্ত, মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য)। কী একটা বই পড়ছে! বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম।' তিরিশ টাকা দাম। আমি যদি স্বামীজীর জীবনী লিখি লোকে পড়বে?

—হ্যাঁ। কেন পড়বে না? নিশ্চয় পড়বে মহারাজ। লেখা শুরু করুন। কারণ আগেই বলেছিলাম স্বামীজীর অনেক তত্ত্ব বেরিয়েছে। আর প্রমথনাথ বসুর বইটা ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে। আপডেটেড বায়োগ্রাফি লেখা উচিত।

সেদিন থেকে গম্ভীর মহারাজ 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' লিখতে শুরু করলেন। দুবছরের মধ্যে প্রায় দুহাজার পৃষ্ঠা লিখে ফেললেন। খুব দ্রুত লিখতে পারতেন। আমি তখনও ট্রেনিং সেন্টারে। আমি ওই বইয়ের এডিটর ছিলাম। যে-সমস্ত তথ্য তিনি বইয়ে ঢোকাতে পারেননি, আমি সেগুলো জোগাড় করে তাঁকে দিতাম। বলতাম—মহারাজ, ওই ঘটনাটা তো দেননি, যা মিরাটে হল। হরি মহারাজের চিঠিতে আছে। স্বামীজী একদিন পোলাও রান্না করলেন। গুরুভাইদের পরিবেশন করে খাওয়ালেন। কিছুই নিজের জন্য রাখলেন না। ওঁরা বললেন—স্বামীজী, আপনার জন্য কিছু রাখলেন না?—আমি জীবনে ঢের খেয়েছি। তোরা খা।

সব দিয়ে দিলেন স্বামীজী। নিজে কিছু খেলেন না। ওইসমস্ত ছোটো ছোটো ঘটনা দিতে থাকতাম, আর গম্ভীরানন্দজী সেসমস্ত বইতে ঢোকাতেন। আমি একদিন বললাম—মহারাজ, কী করে ঢোকান?

—দেখো, নিখিলানন্দ মহারাজের কাছ থেকে এই টেকনিক শিখেছি। উনি যেটা যোগ করতেন সেটা আলাদা সাদা কাগজে লিখতেন আর তারপরে কাটা জায়গায় পেস্ট করতেন। এটা শিখেছি, যাতে আমার গোটা পৃষ্ঠাটা রিরাইট না করতে হয়।

তখন তো কমপিউটার হয়নি। সব হাতে লিখতে হত। বইটা তো লেখা হল। গম্ভীর মহারাজ তিন খণ্ডের তিনটে নাম দিয়েছিলেন—প্রস্তুতি, প্রচার, প্রকল্প। আমি আপত্তি করলাম। বললাম—মহারাজ, প্রকল্প হবে না, খাটবে না।

—কেন?

—প্রকল্প মানে প্রকৃষ্টরূপে কল্পনা। স্বামীজী কি এই সঙ্ঘকে কল্পনা করেছেন? আমার মনে হয় প্রবর্তন কথাটা ভালো হবে। প্রকল্পের 'প্র' অনুপ্রাসটিও এতে আছে।

—তোমার প্রবর্তন-এর পক্ষে কী যুক্তি আছে দেখাও।

—মহারাজ, বুদ্ধদেব যখন নির্বাণ লাভ করে সারনাথে এলেন তখন তিনি 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' করলেন। প্রবর্তন কথাটাই এখানে খাটবে। স্বামীজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রবর্তন করেছেন।

—আচ্ছা, ঠিক বলেছ। তাই বসাও।

অন্য কেউ হলে বলত—না, আমি যা লিখেছি তাই হবে। গম্ভীর মহারাজকে শুধু যুক্তিটা দেখিয়ে দিলেই হত। মনে পড়ে স্বামীজী বলেছেন, প্রেম আর স্বাধীনতা উন্নতির দুটি প্রধান শর্ত।

গম্ভীর মহারাজ একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কী চাও?

—কিছুই না।

—আশীর্বাদও না?

—দ্যাট ইউ আর শাওয়ারিং অল দ্য টাইম। আই নিড নট আস্ক ফর ইট।

তিনি একটু হাসলেন।

একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কতগুলি প্রবলেম আছে বলো তো?

—মহারাজ, ঠাকুরের কৃপায় আমার ব্যক্তিগত কোনও প্রবলেম নেই। তবে আশ্রমের প্রবলেম, ভক্তদের প্রবলেম অনেক সময় ডিল করতে হয়। আপনার কত প্রবলেম আছে, বলুন?

—দেখো (উনি তখন জেনারেল সেক্রেটারি), প্রত্যেক দিন চিঠি খুলে আমি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা প্রবলেম পাই।

—কী করে সল্‌ভ করেন?

—ঠাকুরই সল্‌ভ করে দেন।

১৯৬৬ সালে আমি ট্রেনিং সেন্টারে। সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যের পরে আমরা সব জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজের ঘরে গিয়ে বললাম—মহারাজ আমাদের কিছু বলুন।

—দেখো, বলবার এখন কিছু নেই। স্বামীজীর জীবনী লিখছি। ওতে একটা চ্যাপটার আছে : নবীন সন্ন্যাসী সঙ্ঘ। এ-ছেলেটা আমার হাতের লেখা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, ও-ই পড়বে।

আমি সেটা পড়ে সবাইকে শোনালাম।

একবার স্বামীজীর জন্মোৎসবে বিকেলে মঠে গিয়েছি। রাজা মহারাজের মন্দিরের পশ্চিমে গম্ভীর মহারাজ আর ভরত মহারাজ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছেন। শ্রদ্ধাবশত আমি ভরত মহারাজকে প্রণাম করে ওঁদের ছায়া না মাড়িয়ে ঘুরে এসে গম্ভীর মহারাজকে আবার প্রণাম করলাম। ভরত মহারাজ বললেন—বৈষ্ণবী ঢংটা তো বেশ শিখেছ! আর গম্ভীর মহারাজ বললেন—আমরা কি এতই অস্পৃশ্য যে তুমি আমাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে চাও না?

১৯৬৮ সালে ব্যারাকপুরে বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের বার্ষিক অধিবেশন হল। গম্ভীরানন্দজীর সঙ্গে গেছি। আমার বাবা গিয়ে তাঁকে বলেন—মহারাজ, আমাদের বাড়িতে আসতে হবে।

—আপনাদের চিনি না। কেন আপনাদের বাড়িতে যাব?

গম্ভীর মহারাজ যখন জানতে পারলেন যে উনি আমার বাবা, তখন বললেন—যেতে পারি একটা শর্তে, আপনার বাড়িতে কিছু খাব না।

অবশেষে বাড়িতে গেলেন। আমার মা এক থালা সন্দেশ আর জল দিয়েছিলেন। মহারাজ বললেন—আগেই বলেছি, আপনাদের বাড়িতে কিছু খাব না।

আমি বললাম—মহারাজ, এঁরা গৃহস্থ। ঠাকুর বলেছেন গৃহস্থের বাড়িতে গেলে একটু কিছু খেতে হয়। আপনি সন্দেশ একটু ভেঙে মুখে দিন আর জল খান।

ব্যস। মহারাজ ঠিক তাই করলেন।

আমার সন্ন্যাস হয় ১৯৬৯ সালে। তারপর একদিন গম্ভীরানন্দজী আমায় বললেন—ওহে, তোমার নাম মিশনের বক্তৃতার লিস্টে দিয়ে দিয়েছি।

—আমি বক্তৃতায় বিশ্বাস করি না। আগে তো ভগবানলাভ হোক, তারপর বক্তৃতা।

—বিশ্বাস কর বা না কর, তোমার নাম ওখানে রয়েছে। তোমাকে মিশনের মেম্বার হতে হবে।

সব সাধু মিশনের মেম্বার নয়। সেখানে চিদাত্মানন্দজী ছিলেন, পরে আমাকে ডেকে বকুনি দিয়ে বললেন—তুমি জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে শেখনি?

গম্ভীরানন্দজীর সঙ্গে আমি কত ফ্রি ছিলাম উনি জানতেন না। আমিও কিছু বললাম না। *(ক্রমশ)*